ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫: প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ[১]

১৮ মে ২০১৫

[১] ২৬ মে ২০১৫ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত। প্রতিবেদনটির সার-সংক্ষেপ ১৮ মে ২০১৫ তারিখে টিআইবি'র ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. এ টি এম শামসুল হুদা
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ এণ্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মো. রেযাউল করিম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যাণ্ড পলিসি
দিপু রায়, প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যাণ্ড পলিসি
তাসলিমা আক্তার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যাণ্ড পলিসি

গবেষণা সহায়তা
মাহমুদা আক্তার, ইন্টার্ণ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

কৃতজ্ঞতা
মোরশেদা আক্তার, কুমার বিশ্বজিৎ দাস, জাফর সাদেক চৌধুরী, মো. জসিম উদ্দীম, লিপি আমেনা ও মো. জাহিদুল ইসলাম; প্রকৌশলী মো: দেলোয়ার হোসেন মজুমদার, সভাপতি, সচেতন নাগরিক কমিটি, চট্টগ্রাম; টিআইবি-র রিসার্চ এণ্ড পলিসি বিভাগের সকল সহকর্মীসহ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত গবেষণা সহযোগীবৃন্দ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৯৫১ ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। টিআইবি গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বাছাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য, যার মাধ্যমে এ জনগণের মৌলিক নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। বিভিন্ন ধরনের নাগরিক সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন বিশেষ করে দেশের প্রধান দুটি শহরের তিনটি সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত প্রায় এক কোটি ৮৭ লাখ মানুষের জন্য এর ভূমিকা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে প্রায় আট বছর আগে অভিন্ন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মেয়াদ শেষ হলেও পরবর্তীতে দুইভাগে বিভক্ত ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন এই দীর্ঘ সময়ে আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। এ বছরের শুরু থেকে অব্যাহত সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ঘোষণা এবং তাতে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত দেশবাসীর মধ্যে সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে প্রত্যাশার সৃষ্টি করে।

তবে আমাদের দেশে নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন নতুন ঘটনা নয়। নির্বাচনী আইন ও বিধি লঙ্ঘন এবং তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি দেশে প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। টিআইবি'র পূর্বের গবেষণায় দেখা যায় প্রার্থীরা নির্বাচনী ব্যয়ের ঊর্ধ্বসীমার চেয়ে কয়েকগুণ ব্যয়সহ বিভিন্নভাবে নির্বাচনী আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে, যার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা ও পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত হিসাব যাচাই করার যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থার অভাবকে চিহ্নিত করা যায়। বিপুল নির্বাচনী ব্যয় পরবর্তীতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জনের প্রবণতা তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

টিআইবি ইতোপূর্বে নির্বাচন কমিশন ও জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা সংক্রান্ত একাধিক গবেষণা সম্পন্ন করলেও সিটি কর্পোরেশনের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে প্রার্থীরা কতটুকু নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলেন তা এর আগে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করা হয় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি'র গবেষণাভিত্তিক অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এই গবেষণাটি হাতে নেওয়া হয়।

গবেষণাটি টিআইবি'র গবেষক মো. রেযাউল করিম, দিপু রায় ও তাসলিমা আক্তার হেনার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। তিন সিটি কর্পোরেশনের মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন ১৪ জন গবেষণা সহযোগী। টিআইবি'র ঊর্ধ্বতন গবেষক শাহজাদা এম. আকরাম গবেষণাটি সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন। সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান। এছাড়া গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে টিআইবি'র অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীরা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পরিচালনায় টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ড. এ টি এম শামসুল হুদা গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা ও মতামত দিয়েছেন। এছাড়া প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন মজুমদার, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)-চট্টগ্রাম তথ্য সংগ্রহে বিশেষ সহায়তা করেছেন। তাঁদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।

এই গবেষণায় যারা অভিজ্ঞতা, মতামত ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা আশা করি এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণ আমলে এনে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নির্বাচনকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নম্বর

মুখবন্ধ

সার-সংক্ষেপ ৬

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ১১
১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য ১২
১.২ গবেষণা পদ্ধতি ১২

২. তিন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য ১৪

৩. সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিষয়ক আইনি কাঠামো ও সীমাবদ্ধতা ১৫

৩.১ আইনি কাঠামো পর্যালোচনা ১৫
৩.১.১ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ ১৫
৩.১.২ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ ১৫
৩.১.৩ সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০ ১৫
৩.১.৪ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১০ ১৫

৩.২ আইনি কাঠামোয় সীমাবদ্ধতা ও প্রভাব ১৫
৩.২.১ প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা ১৫
৩.২.২ নির্বাচনে প্রার্থীপ্রতি ব্যয়ের সীমা খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ না থাকা ১৬
৩.২.৩ সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের তিনটি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ব্যয়সীমা উল্লেখ না থাকা ১৬
৩.২.৪ প্রতি তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একজন সংরক্ষিত কাউন্সিলর নির্বাচনের বিধান ১৬
৩.২.৫ নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর হালনাগাদের বিধান না থাকা ১৬
৩.২.৬ প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত দাখিলকৃত রিটার্ন যাচাই-বাছাইয়ের বিধান না রাখা ১৬
৩.২.৭ নির্বাচনী প্রচারণায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ না থাকা ১৬

৪. গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের হলফনামা অনুযায়ী তথ্য ১৬
৪.১ প্রার্থীদের লিঙ্গ পরিচয় ১৬
৪.২ প্রার্থীদের বয়স ১৬
৪.৩ প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৭
৪.৪ প্রার্থীদের পেশা ১৭
৪.৫ প্রার্থীদের মাসিক আয় ১৮
৪.৬ প্রার্থীদের সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় ১৮
৪.৭ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে চলমান ফৌজদারি মামলা ১৮

৫. নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ১৮
৫.১ দলীয় সমর্থন পেতে অর্থ লেনদেন ১৮
৫.২ মেয়র প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয় ১৯
৫.৩ মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়ের খাতওয়ারি হার ২০
৫.৪ সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয় ২১
৫.৫ সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের খাতওয়ারি নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের হার ২১
৫.৬ সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় ২২
৫.৭ সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের খাতওয়ারি নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়ের হার ২২
৫.৮ সকল প্রার্থীর আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের ধরন ও হার ২৩

৬.তিন সিটি নির্বাচনে অংশীজনের ভূমিকা
৬.তিন সিটি নির্বাচনে অংশীজনের ভূমিকা ২৪
৬.১ নির্বাচন কমিশন ২৪
৬.২ রাজনৈতিক দল ২৫
৬.৩ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২৫
৬.৪ নাগরিক সমাজ ও সংগঠন ২৫
৬.৫ ভোটার ২৫
৬.৬ সংবাদমাধ্যম (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট) ২৬

৭. উপসংহার ও সুপারিশ ২৬

পরিশিষ্ট
পরিশিষ্ট ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিন সিটি কর্পোরেশনে ভোটের সার্বিক চিত্র ২৮
পরিশিষ্ট ২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রার্থীদের প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল ২৮
পরিশিষ্ট ৩: নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ২০১০ অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য বিধি-নিষেধসমূহ ২৯

সারণির তালিকা
সারণি ১: গবেষণার নমুনা এলাকা ও প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি ১২
সারণি ২: তথ্যদাতার ধরন ১৩
সারণি ৩: প্রার্থীদের বয়স ১৭
সারণি ৪: প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৭
সারণি ৫: প্রার্থীদের পেশাগত যোগ্যতা ১৭
সারণি ৬: প্রার্থীদের মাসিক আয়ের পরিমাণ ১৮
সারণি ৭: প্রার্থীদের সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমাণ ১৮

চিত্রের তালিকা
চিত্র ১: নির্বাচনী প্রচারণায় মেয়র প্রার্থীদের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ১৯
চিত্র ২: রাজনৈতিক দলীয় সমর্থনভেদে মেয়র প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় ২০
চিত্র ৩: মেয়র প্রার্থীদের খাতওয়ারি নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের শতকরা হার ২০
চিত্র ৪: সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় ২১
চিত্র ৫: সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা বাবদ খাতওয়ারি ব্যয়ের হার ২১
চিত্র ৬: সংরক্ষিত কাউন্সিল প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় ২২
চিত্র ৭: সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা বাবদ খাতওয়ারি ব্যয়ের হার ২২
চিত্র ৮: সকল প্রার্থীর আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের ধরন ও হার ২৩

বক্সের তালিকা
বক্স ১: একজন মেয়র প্রার্থীর দলীয় সমর্থন পেতে অর্থ লেনদেন ১৮
বক্স ২: অভিযোগ করা হলেও রিটার্নিং কর্মকর্তার পদক্ষেপ না নেওয়া ২৪
বক্স ৩: রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থীতা প্রত্যাহারে বাধ্য করা ২৫
বক্স ৪: আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্বে অবহেলা ২৫

ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫: প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। এর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুদৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। বাংলাদেশের জনগণ জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটায়। এসব নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের যথাযথ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৭ সালের ১৫ মে অভিন্ন[২] ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হলেও পরবর্তীতে দুইভাগে বিভক্ত ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে প্রলম্বিত হয় এবং অনির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারা সিটি কর্পোরেশন দুটি পরিচালিত হয়।[৩] এভাবে অনির্বাচিত প্রশাসকদের মাধ্যমে সাত বছরের বেশি সময় ধরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা ছিল কার্যত অসাংবিধানিক। তবে সাম্প্রতিককালের সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ঘোষণা এবং তাতে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত দেশবাসীর মধ্যে সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে প্রত্যাশার সৃষ্টি করে। টিআইবি তার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত সময়ে জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচন কমিশনের ওপর একাধিক গবেষণা পরিচালনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনা, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নির্বাচনী আইন-কানুন ও আচরণ-বিধি কতটুকু পালন করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করা ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

১.২ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যভিত্তিক গবেষণা, যেখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথমে তিন সিটি কর্পোরেশনের সবগুলো তথা ১৩৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি (২০.৯০%) ওয়ার্ডকে জনসংখ্যা, ভোটারের আকার ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে গবেষণা নমুনা এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ২৮টি ওয়ার্ডই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ওয়ার্ড হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়। নমুনা প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য মেয়র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বেশি প্রতিযোগিতা হতে পারে এই বিবেচনায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থীদের তিনজন করে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়ার্ডে মোট চারজন (দুইজন সাধারণ ও দুইজন সংরক্ষিত কাউন্সিলর) করে সর্বমোট ১০১ জন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী[৪] গবেষণার নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

প্রত্যক্ষ তথ্যদাতার মধ্যে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ও সম্যক অবহিত এবং তথ্য প্রদানে সম্মত মেয়র, কাউন্সিলর প্রার্থী, প্রার্থীদের কর্মী, নির্বাচনী এজেন্ট, রাজনৈতিক নেতা, ভোটার ও স্থানীয় জনসাধারণ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মী, আইন-শৃংখলাবাহিনীর সদস্য, সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য, নির্বাচনী কর্মকর্তা, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও অন্যান্য ব্যক্তিসহ মোট ৮৭২ জন তথ্যদাতার কাছ থেকে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে ছিল নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, বই, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট সংবাদ মাধ্যম ও ওয়েবসাইট।

গবেষণার আওতাভুক্ত ঘটনাগুলোর ওপর একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ও একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়। এই গবেষণায় ২০১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হতে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর ২০১৫ সালের ৮ থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য, এই গবেষণার পর্যবেক্ষণ তিনটি সিটি কর্পোরেশনের সকল প্রার্থী ও কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

---

[২] মহাজোট সরকার ২০১১ সালের ৩০ নভেম্বর ঢাকা সিটি কর্পোরেশকে ভেঙ্গে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে বিভক্ত করে।

[৩] ড. বদিউল আলম মজুমদার (২০১৫) *'সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন: কিছু প্রশ্ন ও উদ্বেগ'* দৈনিক যুগান্তর, ৬ এপ্রিল।

[৪] সাধারণ প্রার্থী ৫৬ জন, সংরক্ষিত প্রার্থী ৪৫ জন।

২. গবেষণার ফলাফল

২.১ আইনগত সীমাবদ্ধতা

স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০১১ সাল পর্যন্ত সংশোধিত)', 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০', 'সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৫ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ সকল বিধিমালা পর্যালোচনায় কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে - নির্বাচনে প্রার্থীপ্রতি ব্যয়ের সীমা খাতভিত্তিক (যেমন পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ব্যানার সংখ্যা) সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ না থাকা; প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা ও অতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না রাখা; নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর হালনাগাদের বিধান না রাখা; প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত দাখিলকৃত রিটার্ন যাচাই-বাছাইয়ের বিধান উল্লেখ না থাকা; প্রতি তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একজন সংরক্ষিত কাউন্সিলর নির্বাচনের বিধান রাখা এবং তাদের ব্যয়সীমার ক্ষেত্রে পৃথক নিয়ম না রাখা; ইত্যাদি। এছাড়া 'সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালায় (২০১০) নির্বাচনী প্রচারণায় তথ্য প্রযুক্তি যেমন- ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ইত্যাদি ব্যবহার ও ব্যয় সম্পর্কে উল্লেখ নেই। সার্বিকভাবে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা কার্যত নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে।

২.২ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের হলফনামা অনুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য

গবেষণা নমুনার অন্তর্ভুক্ত নয়জন মেয়র প্রার্থী এবং ৫৬ জন সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী সবাই পুরুষ। মেয়র প্রার্থীদের গড় বয়স ৫৪, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের গড় বয়স যথাক্রমে ৫২ বছর ও ৪৫ বছর। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার হার কিছুটা বেশি হলেও অর্থাৎ নয়জনের মধ্যে পাঁচজন স্নাতক/স্নতকোত্তর ডিগ্রিধারী হলেও সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রায় এক তৃতীয়াংশই নিরক্ষর ও স্ব-শিক্ষিত। পেশাগত দিক থেকে সব মেয়র প্রার্থী হলফনামায় নিজেদের প্রধান পেশা ব্যবসা হিসেবে উল্লেখ করেছেন; অপরদিকে, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা নিজেদের প্রধান পেশা হিসেবে যথাক্রমে ব্যবসা (৭৩.২%) ও গৃহকর্ম (৪৬.৭%) উল্লেখ করেছেন। মাসিক আয় হিসেবে মেয়র প্রার্থীদের গড় আয় ২৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; পক্ষান্তরে, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীর ক্ষেত্রে গড় মাসিক আয় যথাক্রমে চার লক্ষ ৯৪ হাজার ও এক লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। নির্বাচনী হলফনামায় সম্ভাব্য মোট গড় ব্যয় হিসেবে মেয়র, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা যথাক্রমে ৩৩ লক্ষ ৪৬ হাজার, দুই লক্ষ ৮৩ হাজার ও তিন লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা উল্লেখ করেছেন। চলমান ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায় নয়জনের মধ্যে তিনজন মেয়র প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে, এদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ৩৭টি মামলা রয়েছে, আর সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ৪১.০৭ শতাংশ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ১১.১ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলমান রয়েছে।

২.৩ নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

দলীয় সমর্থন পেতে অর্থ লেনদেন: মেয়র পদে দলীয় সমর্থন পাওয়ার জন্য কোনো কোনো প্রার্থীকে অর্থ দিতে হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রার্থীদের সবাইকে ২০ লক্ষ থেকে ৭ কোটি পর্যন্ত অর্থ দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। তবে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মেয়র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে, কাউন্সিলর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দলীয় সমর্থন পাওয়ার জন্য প্রার্থীদের একাংশ কর্তৃক অর্থ দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশকে দুই লক্ষ হতে পাঁচ লক্ষ টাকা ও নারী কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশকে দুই লক্ষ হতে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, ঢাকার দুই সিটির সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশের ক্ষেত্রেও এক লক্ষ হতে আট লক্ষ টাকা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তবে ঢাকার সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশের ক্ষেত্রে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ থাকলেও অর্থের পরিমাণ জানা যায় নি।

মেয়র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, দলীয় তহবিল, উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক দলের উর্ধ্বতন নেতা ও উপদেষ্টাকে প্রার্থী নিজে ও প্রার্থীর পক্ষে স্থানীয় ঠিকাদার, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একাংশ এই অর্থ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কাউন্সিলরদের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য, মেয়র প্রার্থী, স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের একাংশকে প্রার্থী নিজে ও তাদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের পক্ষ হতে অর্থ প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে।

মেয়র প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয়

সিটি কর্পোরেশনভেদে মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, নয়জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে একজন ব্যতীত সবাই তাদের ব্যয়সীমা অতিক্রম করেছেন। উল্লেখ্য, বিধিমালা অনুযায়ী তিন সিটি কর্পোরেশন এর জন্য সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ঢাকা উত্তরে ৫০ লক্ষ এবং ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রামের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা করে নির্ধারিত। মেয়র প্রার্থীদের ব্যয়সীমার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তিনজন মেয়র প্রার্থীই নির্বাচনী ব্যয়সীমা লঙ্ঘন করেছেন; এর মধ্যে একজন সর্বোচ্চ ছয় কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। অন্যদিকে, ঢাকা দক্ষিণের তিনজন মেয়র প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়সীমা অতিক্রম করলেও উত্তরের শুধু একজন প্রার্থী নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে ছিলেন। উল্লেখ্য, ঢাকা উত্তরের একজন মেয়র প্রার্থী সর্বোচ্চ তিন কোটি ৬০ লক্ষ টাকা এবং ঢাকার দক্ষিণের একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ তিন কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। মেয়র প্রার্থীদের গড় ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রার্থীরা গড়ে দুই কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, অপরদিকে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণের প্রার্থীরা গড়ে যথাক্রমে এক কোটি ৬০ লক্ষ ও দুই কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।

রাজনৈতিক দলীয় সমর্থনভেদে মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীরা তিন সিটি কর্পোরেশনেই বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থী অপেক্ষা বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন। ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীরা গড়ে তিন কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ছয় কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। অপরদিকে, বিএনপির প্রার্থীরা ঢাকায় গড়ে এক কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা এবং চট্টগ্রামে এক কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থীরা যথাক্রমে ঢাকায় গড়ে ৮৩ লক্ষ ও চট্টগ্রামে ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।

মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়ের খাতওয়ারি হার: তিন সিটি কর্পোরেশনে খাতভিত্তিক নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, পোস্টার ও লিফলেট বাবদ সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে ঢাকায় মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের ২৮.৮ শতাংশ অর্থ এবং চট্টগ্রামে ২৭.৫ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে। এছাড়া নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন করে চট্টগ্রামে মেয়র প্রার্থীরা যাতায়াত ও পরিবহন (১০.৮%), জনসভা (১৭.৬%) ও মিছিল/শোডাউনে (১৪.৭%) অর্থ ব্যয় করেছেন। তবে ঢাকায় এই তিনটি খাতে অর্থ ব্যয়ের হার যথাক্রমে ৩.৭ শতাংশ, ৩.৫ শতাংশ, ৬.১ শতাংশ।

সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয়: প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীরা গড়ে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন যার পরিমাণ ২৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। অন্যদিকে, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের কাউন্সিলর প্রার্থীরা ব্যয় করেছেন গড়ে ১৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। অন্যদিকে, তিন সিটি কর্পোরেশনে আওয়ামী সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা (চট্টগ্রামে ২৬ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা এবং ঢাকায় ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা) বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের (চট্টগ্রামে ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এবং ঢাকায় নয় লক্ষ ১৪ হাজার টাকা) তুলনায় বেশি ব্যয় করেছে। উল্লেখ্য সিটি নির্বাচনে সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ছিল ছয় লক্ষ টাকা।

সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের খাতওয়ারি হার: ঢাকায় প্রার্থীরা সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করেছেন যথাক্রমে পোস্টার, লিফলেট ও প্লাকার্ড (৩০.৬%) বাবদ। পক্ষান্তরে, চট্টগ্রামে প্রার্থীদের সর্বাধিক অর্থ ব্যয় হয়েছে ক্যাম্প স্থাপন (২১.০%) ও জনসংযোগে (১৯.৭%)।

সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়: তিন সিটি কর্পোরেশনেই আওয়ামী সমর্থিত প্রার্থীরদের নির্বাচনী গড় ব্যয় বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের চেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। চট্টগ্রামে আওয়ামী ও বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় যথাক্রমে ১৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ও ১১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। অন্যদিকে, ঢাকায় আওয়ামী ও বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় যথাক্রমে ১৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ও আট লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, সিটি নির্বাচনে সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ঢাকায় নয় লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা এবং চট্টগ্রামে ১০ লক্ষ আট হাজার টাকা।

সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের খাতওয়ারি হার: ঢাকায় প্রার্থীরা সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করেছেন যথাক্রমে পোস্টার ও লিফলেট (২৬.৩%) এবং কর্মী ও এজেন্ট বাবদ (১৪.৪%)। অন্যদিকে, চট্টগ্রামের প্রার্থীদের সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করেছেন ক্যাম্প স্থাপন (২১.২%) ও জনসংযোগে (১৯.৮%)।

সকল প্রার্থীর আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের ধরন ও হার: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বাধিক ৫৮ শতাংশ প্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ক্যাম্পে খাবার, পানীয়, উপহার ও বকশিস প্রদান করেছেন; নির্ধারিত সময়ের আগে ও পরে প্রচারণার কাজে মাইক ব্যবহার করেছেন ৪২ শতাংশ এবং একসাথে একাধিক মাইক ব্যবহার করেছেন ৪১ শতাংশ প্রার্থী; ধর্মীয় উপসানলয়ে প্রচারকাজ চালিয়েছেন ৪২ শতাংশ প্রার্থী। এছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে জনসভা (৪০%), মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় শো-ডাউন (২৬%), যানবাহন সহকারে মিছিল ও শো-ডাউন (২৩%), প্রার্থীদের পক্ষে প্রকাশ্যে ও গোপনে চাঁদা দেওয়া (২০%) ইত্যাদি ধরনের লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে।

২.৪ তিন সিটি নির্বাচনে অংশীজনের ভূমিকা

নির্বাচন কমিশন: কোনো নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রার্থীদের হলফনামার তথ্য কমিশন তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পাশাপাশি প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত মেয়র প্রার্থীসহ তিনটি সিটি কর্পোরেশনের কিছু সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সতর্ক নোটিশ ও আর্থিক জরিমানা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতা থাকলেও কঠোর শাস্তিমূলক (যেমন- প্রার্থিতা বাতিল) ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। কমিশনের দুর্বল অবস্থানের কারণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হতে দেখা যায় নি। সেনা মোতায়েনের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তহীনতার কারনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগসহ বিতর্কিত অবস্থার সৃষ্টি, কোথাও কোথাও নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্তৃক ভোট জালিয়াতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ, ভোটের দিন কেন্দ্র দখল, কারচুপি, অবাধে ব্যালট পেপারে সিল মারা ইত্যাদি অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কর্মীদের ভোট কেন্দ্রে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও বিভিন্ন কেন্দ্রে সাংবাদিকদের হামলার শিকার হওয়া বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার মতো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা যায়। সর্বোপরি নির্বাচনী আইন ভংগ করে রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন ঘোষণা করলেও সেক্ষেত্রে কমিশন কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

রাজনৈতিক দল: রাজনৈতিক দলগুলোর সরাসরি নির্বাচনী কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার চিত্র লক্ষ করা গেছে। রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে প্রার্থীদের দলীয় সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি অনেক প্রার্থী যারা নিজ দলের সদস্য তাদেরকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে। আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে দলটির সংসদ সদস্যসহ নেতা-কর্মী (স্থানীয় ও বহিরাগত) দ্বারা ব্যাপকভাবে ভোট কেন্দ্রসমূহের একাংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ, ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই, প্রকাশ্যে সিল মারাসহ বিভিন্নভাবে ভোট জালিয়াতি এবং এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে দল সমর্থিত প্রার্থী ও বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে যা নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে দেয়নি। এছাড়া প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় ও অন্যান্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। যেমন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও বিএনপির নির্বাচনী এজেন্ট ও কর্মী না দেওয়া, মেয়র প্রার্থীদের মতামত না নিয়ে ভোটের দিন নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্বাচন বর্জনে বাধ্য করা যা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী: কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় পদক্ষেপ না নেওয়া এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালনসহ কোথাও কোথাও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ভোট জালিয়াতিতে সরাসরি অংশগ্রহণের ঘটনা লক্ষ করা যায়।

নাগরিক সমাজ ও সংগঠন: তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে ঘিরে যেহেতু সকল মহলের মধ্যে একটি আশার সঞ্চার হয়েছিল সেহেতু নাগরিক সমাজও এই নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। তারা প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য ও নির্বাচনী ইশতেহার, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ইত্যাদির ওপর বিশ্লেষণমূলক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করেছে, সঠিক প্রার্থী নির্বাচন, প্রার্থীদের নিয়ে সরাসরি টকশো ও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান গোলটেবিল আলোচনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তবে নাগরিক সমাজের দুইটি অংশ দুইটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালায় যা জনমনে বিতর্কের সৃষ্টি করে।

ভোটার: নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারদের কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভোটারদের অনেকে ভোট দিতে পারলেও অনেক ক্ষেত্রে জাল ভোট প্রদান ও বাধার মুখে কেউ কেউ ভোট দিতে পারে নি। তাছাড়া নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানের জন্য ভোটারদের প্রার্থীদের আয়োজনে ভোট কেন্দ্রে আসা এবং ভোটের আগের দিন রাতে বিভিন্ন বস্তি ও কলোনীতে প্রার্থী কর্তৃক বিতরণকৃত অর্থ নিম্ন আয়ের লোকজন দ্বারা গ্রহণ লক্ষণীয়।

সংবাদমাধ্যম (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট): তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব ভূমিকার মধ্যে প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য ও নির্বাচনী ইশতেহারের তথ্য ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নির্বাচনী প্রচারণা কার্যক্রম ও আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা, নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য অংশীজনের কর্মকাণ্ড প্রচার ও প্রকাশ করেছে। বেসরকারি চ্যানেলগুলোতে প্রার্থীদের নিয়ে সরাসরি টকশো ও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান এ ধরনের কার্যক্রম প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে। তবে প্রথম দিকে প্রধান দুটি দলসমর্থিত মেয়র প্রার্থীদের প্রচারণা সংক্রান্ত সংবাদ অন্য প্রার্থীর তুলনায় বেশি প্রাধান্য পেলেও পরবর্তীতে অন্য প্রার্থীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়। নির্বাচনের দিন কেন্দ্রভিত্তিক অনিয়ম তুলে ধরার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. উপসংহার ও সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কার্যত একটি দলীয় নির্বাচনে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থী নির্বাচন ও সমর্থন দান, প্রার্থীদের পক্ষ থেকে দলীয় সমর্থন নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো, দলের পক্ষ থেকে প্রার্থীদের নির্বাচন বর্জনে বাধ্য করা, সরকারের পক্ষ থেকে সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা ব্যবহার ও প্রভাব বিস্তার করা ইত্যাদি ঘটনা এক নির্বাচনেরই বহিঃপ্রকাশ। এছাড়া ভোটকেন্দ্রে বিরোধীদল সমর্থিত প্রার্থীর এজেন্ট ও দলীয় সমর্থকদের ব্যাপক অনুপস্থিতি এবং দলীয় নির্দেশনায় নির্বাচনের দিন মধ্যপথে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের ঘটনা নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তাদের আন্তরিকতা ও উদ্দেশ্যকে বিতর্কিত করে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালন করতে ব্যর্থতার পরিচয় পরিচয় দিয়েছে। নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তা দেখাতে না পারা, নির্বাচনী আইন সব প্রার্থীর জন্য সমানভাবে প্রয়োগ না হওয়া, আচরণ বিধি লঙ্ঘনে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের কারণে নির্বাচনে সকল প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর কর্মকর্তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। প্রার্থীদের পক্ষ থেকেও আচরণ বিধি মেনে না চলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রার্থী কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও আচরণবিধি লঙ্ঘন লক্ষণীয়। সার্বিক বিবেচনায় তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলা যায় না।

সুপারিশমালা

১. সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনী আইনের সংস্কার ও হালনাগাদ করতে হবে-
   - সকল প্রার্থীর নির্বাচনী সর্বোচ্চ ব্যয়ের সীমা খাত অনুযায়ী (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ) নির্দিষ্ট করতে হবে;
   - নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের বিধান রাখতে হবে;
   - নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;
   - সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের ব্যয়সীমা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট করতে হবে;
   - প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত দাখিলকৃত রিটার্ন যাচাই-বাছাইয়ের বিধান রাখতে হবে;
   - সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারকে নির্বাচনী বিধির আওতায় আনতে হবে।

২. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীর হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. ভোট জালিয়াতি বন্ধ করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এবং ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ব্যবহার করতে হবে।

৪. নির্বাচন কর্মকর্তা (প্রিজাইডিং, রিটার্নিং, ও পোলিং কর্মকর্তা) এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত পরিবেশে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. ভোট কেন্দ্রে সাংবাদিকদের সহজ প্রবেশাধিকারসহ নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. রাজনৈতিক প্রভাব ও বাইরের চাপ উপেক্ষা করে দায়িত্ব পালনের মত যোগ্য ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দিতে হবে।

৭. অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে তার সাংবিধানিক ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

.....

ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫: প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

মূল প্রতিবেদন

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। এর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুদৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়।[৫] বাংলাদেশের জনগণ জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটায়। এসব নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী এবং অন্যান্য অংশীজনের যথাযথ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৭ সালের ১৫ মে অভিন্ন[৬] ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মেয়াদ শেষ হলেও পরবর্তীতে দুইভাগে বিভক্ত ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে প্রলম্বিত হয় এবং অনির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারা সিটি কর্পোরেশন দুটি পরিচালিত হয়।[৭] এভাবে অনির্বাচিত প্রশাসকদের মাধ্যমে সাত বছরের বেশি সময় ধরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা ছিল কার্যত অসাংবিধানিক। তবে সাম্প্রতিককালের সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ঘোষণা এবং তাতে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত দেশবাসীর মধ্যে সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে প্রত্যাশার সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের মতো একটি স্বল্প আয়ের দেশে বিপুল নির্বাচনী ব্যয় পরবর্তীতে জনপ্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার তথা দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ আহরণের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। প্রকারান্তরে নির্বাচনী ব্যয় পরিণত হয় একটি বিনিয়োগে এবং জনপ্রতিনিধির ভূমিকা অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সহায়ক না হয়ে বিরূপ হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। নির্বাচনী প্রচারনায় প্রার্থীদের ব্যয় সম্পর্কে টিআইবি'র পূর্বের গবেষণায় নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চসীমা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও তা প্রতিরোধে নির্বাচন কমিশনের কোনো ভূমিকা পালন না করার তথ্য উঠে আসে।[৮]

বিশেষত বিগত দেড় দশকে রাজনীতি একটি বিনিয়োগে পরিণত হওয়ার বিষয়টি অধিকতর হারে লক্ষ করা যায় যাকে সুশাসনের অবক্ষয় ও ব্যাপক দুর্নীতির পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে অনেকেই চিহ্নিত করেন।[৯] জাতীয় সততা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমাগত রাজনীতিকরণের শিকার হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যা নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত সেটি দলীয় প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠে নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে পারছে কি না তা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। আইন-শঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। এছাড়া একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হস্তান্তর নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর যে দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা প্রয়োজন তার উপস্থিতি বাংলাদেশে দেখা যায় না।

সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পূর্বে অন্য সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও এসকল নির্বাচনে প্রার্থীরা কতটুকু নির্বাচনী আচরণ-বিধি মেনে চলেন তা পর্যবেক্ষণের ওপর গবেষণার অভাব রয়েছে। এমতাবস্থায় ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের ঘোষণা হলে, টিআইবি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচন সংক্রান্ত ধারাবাহিক কার্যক্রমে অংশ হিসেবে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও তাতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাসহ অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করার জন্য তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

---

[৫] Bangkok Declaration, http://aesforum.anfrel.org/the-bangkok-declaration/, accessed on 25/05/2015.

[৬] মহাজোট সরকার ২০১১ সালের ৩০ নভেম্বর ঢাকা সিটি কর্পোরেশকে ভেঙ্গে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে বিভক্ত করে।

[৭] ড. বদিউল আলম মজুমদার (২০১৫) *'সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন: কিছু প্রশ্ন ও উদ্বেগ' দৈনিক যুগান্তর*, ৬ এপ্রিল।

[৮] আকরাম এম শাহজাদা ও দাস সাধন কুমার, *নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, টিআইবি*, ফেব্রুয়ারি ২০১০।

[৯] তানভীর মাহমুদ, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬), টিআইবি*, ২০০৭।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হলো-

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করা;
২. সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নির্বাচনী আইন-কানুন ও আচরণ-বিধি কতটুকু পালন করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করা;
৩. নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

১.২ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যভিত্তিক গবেষণা। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যগুলো সাক্ষাৎকার ও অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য সিটি কর্পোরেশনভুক্ত বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে সিটি কর্পোরেশনগুলোর গবেষণার জন্য নমুনা ওয়ার্ড ও প্রার্থী নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো:

গবেষণাধীন এলাকা ও প্রার্থী নির্বাচন

জনসংখ্যা ও ভোটারের আকার ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে তিন সিটি কর্পোরেশনে ১৩৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি (২০%) ওয়ার্ডকে গবেষণার নমুনা আকার হিসেবে নেয়া হয়। সিটি কর্পোরেশনগুলোর অঞ্চলগুলোকে স্তর হিসেবে বিবেচনা করে দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রতি স্তর থেকে আনুপাতিকহারে ২৮টি ওয়ার্ড বণ্টন করা হয়।

সারণি ১: গবেষণার নমুনা এলাকা ও প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি

সিটি কর্পোরেশন	ওয়ার্ড সংখ্যা	অঞ্চল সংখ্যা	নমুনা ওয়ার্ড সংখ্যা	প্রার্থী সংখ্যা		
				মেয়র	সাধারণ কাউন্সিলর	সংরক্ষিত কাউন্সিলর
ঢাকা উত্তর	৩৬	৫	৯	৩	১৮	১১
ঢাকা দক্ষিণ	৫৭	৫	১১	৩	২২	২০
চট্টগ্রাম	৪১	৮	৮	৩	১৬	১৪
মোট	**১৩৪**	**১৮**	**২৮**	**৯**	**৫৬**	**৪৫**

প্রার্থীদের মধ্যে সম্ভাব্য বেশি প্রতিযোগিতা হতে পারে এই বিবেচনায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থীদের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১০] মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনটি সিটি কর্পোরেশন হতে তিনজন করে (আওয়ামী সমর্থিত, বিএনপি সমর্থিত ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত) মোট নয়জন প্রার্থী নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়ার্ডে মোট চারজন (দুইজন সাধারণ ও দুইজন সংরক্ষিত কাউন্সিলর) করে সর্বমোট ১০১ জন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী গবেষণার নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এদের মধ্যে সাধারণ আসনের প্রার্থী ২৮টি ওয়ার্ডে ৫৬ জন এবং সংরক্ষিত আসনে ২৮টি ওয়ার্ডে ৪৬ জন। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা যেহেতু তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে নির্বাচন করে থাকেন, সেহেতু গবেষণা নমুনায় অন্তর্ভুক্ত ওয়ার্ডগুলোর কোনো কোনো ওয়ার্ডে একই প্রার্থী একাধিক ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এক্ষেত্রে নমুনায়িত ওয়ার্ডের ঢাকা দক্ষিণের দুটি, ঢাকা উত্তরের ছয়টি এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দুটি ওয়ার্ডে একজন করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় মোট সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীর সংখ্যা পাঁচটি ওয়ার্ডে ১০ জন কমে দাড়ায় ৪৬ জনে। তবে উক্ত ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে একটি ওয়ার্ডে বিএনপি সমর্থিত একজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা না করায় উক্ত ওয়ার্ড থেকে কোনো বিএনপি প্রার্থী গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি। এভাবে সর্বমোট ৪৫ জন সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

[১০] নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেছে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মেয়র প্রার্থীগণের বিশেষ করে আওয়ামী ও বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। এই নির্বাচনে ঢাকা উত্তর , ঢাকা দক্ষিণ, ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে প্রদত্ত ভোটের হার যথাক্রমে ৩৭.৩ শতাংশ, ৪৮.৪ শতাংশ, ও ৪৭.৯ শতাংশ। বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ২ ও ৩ দেখুন।

প্রত্যক্ষ তথ্যদাতার মধ্যে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ও সম্যক অবহিত এবং তথ্য প্রদানে সম্মত মেয়র, কাউন্সিলর প্রার্থী, প্রার্থীদের কর্মী, নির্বাচনী এজেন্ট, রাজনৈতিক নেতা, ভোটার ও স্থানীয় জনসাধারণ, ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মী, আইন-শৃংখলাবাহিনীর সদস্য, সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য, নির্বাচনী কর্মকর্তানির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও অন্যান্য ব্যক্তিসহ মোট ৮৭২ জন তথ্যদাতার কাছ থেকে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্যদাতাদের মধ্যে ভোটার ও স্থানীয় জনসাধারণ ব্যতীত ৫৩৯ জনই মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে গণ্য।

সারণি ২: তথ্যদাতার ধরন	
তথ্যদাতার ধরন	**সংখ্যা**
মেয়র প্রার্থী	৭
কাউন্সিলর প্রার্থী	৫১
নির্বাচনী এজেন্ট	৫৮
প্রার্থীর ও দলীয় কর্মী	২০৪
রাজনৈতিক নেতা	৩৭
ভোটার ও জনসাধারণ	৩৩৩
সাংবাদিক	৩৮
আইন-শৃংখলাবাহিনী	৪২
গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য	৫
নির্বাচনী কর্মকর্তা	৬৯
বিশেষজ্ঞ	৪
অন্যান্য	২৪
মোট	**৮৭২**

নির্বাচনী ব্যয় প্রাক্কলনের পদ্ধতি

মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য প্রার্থীর সমর্থক দলীয় নেতা ও কর্মী, ঠিকাদার, দোকানদার, স্থানীয় ভোটার, ও সাধারণ জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। উক্ত নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রার্থীর একাধিক দলীয় নেতা ও কর্মী, প্রার্থী নিজে, প্রার্থীর এপিএস, প্রার্থীর ভাই, প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট, বিদ্রোহী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

এই গবেষণায় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব প্রাক্কলনে যে ব্যয়গুলো দৃশ্যমান, পরিমাপযোগ্য ও যাচাইযোগ্য সেগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জনসভা, পোস্টার ও লিফলেট, স্টীকার, মিছিল বা শোডাউন, নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন, ধর্মীয়, শিক্ষা, ও ক্লাব/স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠানে অনুদান, জনসংযোগ, মাইকিং, যাতায়াত ও পরিবহন, প্লাকার্ড, মোবাইল বিল, নির্বাচনী এজেন্ট ও কর্মী ব্যয়, ফটোকপি, ডিজিটাল ব্যানার ইত্যাদি খাতের ব্যয়গুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। উক্ত ব্যয় প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থী খাতভিত্তিক মোট কী পরিমাণ বা সংখ্যায় ব্যয় করেছে তার ওয়ার্ডভিত্তিক হিসাব করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্যের উৎস

পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টমাধ্যম এবং ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের সময়

এই গবেষণায় ২০১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হতে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর ২০১৫ সালের ৮ থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা

গবেষণার আওতাভুক্ত ঘটনাগুলোর ওপর একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ও একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়। উল্লেখ্য, এই গবেষণার পর্যবেক্ষণ তিনটি সিটি কর্পোরেশনের সকল প্রার্থী ও কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা
এই গবেষণায় যথাযথ নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার জন্য শুধু দৃশ্যমান ব্যয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অদৃশ্য ব্যয়ের তথ্য (যেমন, ভোটারদের অর্থ প্রদান, রাজনৈতিক দলের কেন্দ্র থেকে ওয়ার্ড প্রতি নেতা-কর্মীদের অর্থ প্রদান) সংগ্রহ করা হলেও তা যাচাই করার যথাযথ প্রক্রিয়ার অভাবে এ ধরনের ব্যয়ের ওপর কোনো তথ্য দেওয়া সম্ভব হয় নি।

প্রতিবেদন কাঠামো
বর্তমান প্রতিবেদন কাঠামো ছয়টি অংশ বিভক্ত। প্রথম অংশে গবেষণা প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, ও গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আইনি কাঠামোয় সীমাবদ্ধতা ও প্রভাব, তৃতীয় অংশে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের হলফনামা ও আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য, চতুর্থ অংশে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ, পঞ্চম অংশে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণার সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

২. তিন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য
২০১৪ সালের আট ডিসেম্বর সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।[১১] নির্বাচন কমিশন ২০১৫ সালের ১৮ মার্চ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন এবং এর পরদিন হতে ২৯ মার্চ পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র বিক্রি ও জমা গ্রহণ করে। মনোনয়ন যাচাই-বাছাই করা হয় এক ও দুই এপ্রিল এবং মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল নয় এপ্রিল। নির্বাচনী প্রচারণার সময় ছিল সাত এপ্রিল হতে শুরু করে ২৬ এপ্রিল রাত ১২টা পর্যন্ত।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই তিন প্রতিষ্ঠানের অধীন প্রায় এক কোটি ৮৭ লক্ষ জনসংখ্যা রয়েছে।[১২] তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ ২৯ হাজার ১২৭টি, এরমধ্যে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রামে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯০০টি, ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৭৭৮টি ও ১৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৪৯টি। নির্বাচনে প্রদত্ত গড় ভোটের হার ৪৩.৯ শতাংশ, সর্বাধিক ভোট পড়ে ঢাকা দক্ষিণে, ৪৮.৪ শতাংশ। এছাড়া চট্টগ্রামে ৪৭.৯ শতাংশ এবং ঢাকা উত্তরে ৩৭.৩ শতাংশ ভোট পড়ে। উল্লেখ্য, নির্বাচনে তিন সিটিতে প্রদত্ত ভোটের প্রায় ৪.৫৭ শতাংশ ভোট (এক লক্ষ ২১ হাজার তিনটি ভোট) বাতিল হয়।[১৩]

নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা উত্তরের মেয়র প্রার্থী পেয়েছে চার লক্ষ ৬০ হাজার ১১৭ ভোট, ঢাকা দক্ষিণে মেয়র প্রার্থী পেয়েছে পাঁচ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৯৬ এবং চট্রগ্রামের মেয়র প্রার্থী পেয়েছে চার লক্ষ ৭৫ হাজার ৩৬১ ভোট। এরপরে মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা হচ্ছে ঢাকা উত্তরে তিন লক্ষ ২৫ হাজার ৮০ ভোট, ঢাকা দক্ষিণে দুই লক্ষ ৯৪ হাজার ২৯১ ভোট, এবং চট্টগ্রামে তিন লক্ষ চার হাজার ৮৩৭ ভোট।[১৪] বিজয়ী মেয়র প্রার্থীরা সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত। তাদের তিনজন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীরা সকলে ছিলেন বিএনপি সমর্থিত।

সাধারণ কাউন্সিলর পদে তিন সিটিতে সবচেয়ে বেশি জয়ী হয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ও আওয়ামী বিদ্রোহী প্রার্থী, ১০৬ জন। এরপরেই রয়েছে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী, ১১ জন। অন্যান্য যেমন জামায়াত/জাতীয় পার্টি/স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয় ১৭ জন। সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জয়ী হয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ও আওয়ামী বিদ্রোহী প্রার্থী, ৩০ জন। এরপরেই রয়েছে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী, ১০ জন। অন্যান্য প্রার্থী জয়ী হয়েছেন পাঁচজন।[১৫]

---

[১১] *দৈনিক যুগান্তর*, ১৬ এপ্রিল ২০১৫।
[১২] এ বিষয়ে কোনো হলনাগাদ তথ্য পাওয়া যায় নি, তবে বেসরকারি বিভিন্ন সূত্র যেমন, যঃঃঢ়://ŕŕŕ.ঃযবফধরষুংঃধৎ.হবঃ/ৎবংরহম-ঢ়ড়ঢ়ঁষধঃরড়হ-নরম-পড়হপবৎহ-ভড়ৎ-ফযধশধ-৩৩০৮১;যঃঃঢ়://ŕŕŕ.রহফবীসঁহফর.পড়স/নধহমষধফবংয/ফবসড়মৎধঢ়যরপংথঢ়ৎড়ভরষব.যঃসষ; যঃঃঢ়://ŕŕŕ.ঃযবড়ফড়ৎধ.পড়স/ভিনপঁৎবহঃ/নধহমষধফবংয/নধহমষধফবংযথঢ়বড়ঢ়ষব.যঃসষ থেকে সংগৃহিত তথ্য অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীতের বসবাসরত জনসংখ্যা হলো এক কোটি ৪৭ লক্ষ হতে এক কোটি ৭০ লক্ষ এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ। তবে এরমধ্যে অস্থায়ী অভিবাসীরাও রয়েছেন যারা ভোটার নন।
[১৩] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ১ দেখুন।
[১৪] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ২ দেখুন।
[১৫] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।

৩. সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিষয়ক আইনি কাঠামো ও সীমাবদ্ধতা

৩.১ আইনি কাঠামো পর্যালোচনা

নির্বাচন কমিশন জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচনী কার্যক্রম আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালনা করে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনী প্রক্রিয়া কার্যক্রম যে সকল আইন ও বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০, সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১০। নিম্নে উক্ত আইন ও বিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

৩.১.১ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯

এই আইনটিতে সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা, ওয়ার্ড বিভক্তিকরণ ও সীমানা নির্ধারণ, মেয়র ও কাউন্সিলর সম্পর্কিত বিধান, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচনী বিরোধ, কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী, কর্পোরেশনের নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্য পরিচালনা, কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও কর, কর্পোরেশন পরিচালনায় অপরাধ ও দণ্ড, কর্পোরেশন সংক্রান্ত সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী, নাগরিকদের তথ্যাদি প্রাপ্তির অধিকার, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, বেসরকারি হাসপাতাল ইত্যাদির নিবন্ধিকরণ, আপিল, ক্ষমতা অর্পণ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।[১৬] পরবর্তীতে এই আইনের কয়েকটি ধারাতে সংশোধনী আনা হয় যা স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত।[১৭]

৩.১.২ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০

এই বিধিমালায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়ের খাত এবং এর উৎসসমূহ, প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়ের সীমা, নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব, নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন ও ব্যয়ের তথ্য সম্পর্কে ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও রিটার্নিং, প্রিজাইডিং, ও পোলিং কর্মকর্তা এবং নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট নিয়োগ ও তাদের দায়িত্বাবলী ও নির্বাচনে প্রার্থীর জামানত, মনোনয়নপত্র বাছাই, গ্রহণ ও বাতিল, প্রার্থিতা প্রত্যাহার, প্রতীক বরাদ্দ, ভোট কেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষা, ভোট গ্রহণ ও নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ প্রভৃতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।[১৮]

৩.১.৩ সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০

এই বিধিমালাং নির্বাচনী প্রচারণা ও নির্বাচনের দিনের নিয়মাবলী যেমন- বিলবোর্ড, গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ ও প্যাণ্ডেল, আলোকসজ্জার ব্যবহার, মাইকের ব্যবহার, জনসভা, পোস্টার প্রভৃতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।[১৯]

৩.১.৪ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১০

এই বিধিতে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর, এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের নির্বাচনে গোপন ব্যালট বা ক্ষেত্রমত, ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা যাবে বলে উল্লিখিত রয়েছে।[২০]

৩.২ আইনি কাঠামোয় সীমাবদ্ধতা ও প্রভাব

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সংক্রান্ত আইনি কাঠামো পর্যালোচনায় কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। এসকল সীমাবদ্ধতার কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলো:

৩.২.১ প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা

নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণায় সম্ভাব্য কত টাকা ব্যয় করছেন অর্থাৎ নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ব্যয় করছেন কি না তা সরাসরি পরিবীক্ষণে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কোনো ব্যবস্থা নেই। এতে প্রার্থীদের মধ্যে নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।[২১]

---

[১৬] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট www.ec.org.bd

[১৭] প্রাগুক্ত।

[১৮] প্রাগুক্ত।

[১৯] বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

[২০] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন www.ec.org.bd

[২১] উল্লেখ্য, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী খরচ তদারকিতে কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বিস্তারিত জানতে দেখুন, *বিডি নিউজ২৪*, ৬ অক্টোবর, ২০১১।

৩.২.২ নির্বাচনে প্রার্থীপ্রতি ব্যয়ের সীমা খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ না থাকা

মেয়র, সাধারণ কাউন্সিলর, এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা ভোটার সংখ্যা অনুপাতে সুনির্দিষ্ট করা থাকলেও তা খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা নেই। যেমন পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ব্যানার সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে খাতভিত্তিক ব্যয়ের সীমা উল্লেখ করা নেই। এতে কোনো কোনো খাতে প্রার্থীদের অতিরিক্ত ব্যয়ের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে যা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অসম ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জানান, দলীয় প্রভাবশালী প্রার্থীরা লাখ-লাখ পোষ্টার ছাপাচ্ছে, তাদের পোস্টারের আধিক্যে চাপা পড়ে যাচ্ছে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, যা নির্বাচনী প্রচারণায় সমান সুযোগ তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[২২]

৩.২.৩ সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের তিনটি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ব্যয়সীমা উল্লেখ না থাকা

নির্বাচন বিধিমালায় ভোটার সংখ্যা অনুপাতে মেয়র এবং সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা পৃথকভাবে উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তা পৃথকভাবে উল্লেখ করা নেই। বিধি অনুযায়ী সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে নির্বাচিত হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে তাদের নির্বাচনী এলাকার ভোটার সংখ্যা একজন সাধারণ কাউন্সিলরের নির্বাচনী এলাকার ভোটার সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয়ে থাকে এবং নির্বাচনী প্রচারণার অতিরিক্ত ব্যয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৩.২.৪ প্রতি তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একজন সংরক্ষিত কাউন্সিলর নির্বাচনের বিধান

সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের ওয়ার্ড প্রতি একজন করে এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর নারী প্রার্থীদের তিনটি ওয়ার্ডের বিপরীতে একজন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। যেহেতু তিনটি ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা একটি ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা অপেক্ষা বেশি, সেক্ষেত্রে প্রচারণার ব্যয় বাধ্য হয়ে তুলনামূলক বেশি করতে হয়, যা নির্বাচনী প্রচারণায় সমান সুযোগ সৃষ্টিতে ঝুঁকির সৃষ্টি করে।

৩.২.৫ নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর হালনাগাদের বিধান না থাকা

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নির্বাচনী ব্যয় সীমা হালনাগাদের বিধান উল্লেখ নেই। নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা ২০১০ সালে নির্ধরিত হলেও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তা হালনাগাদ করা হয় নি।

৩.২.৬ প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত দাখিলকৃত রিটার্ন যাচাই-বাছাইয়ের বিধান না রাখা

নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানে যেমন কোনো ব্যবস্থা নেই, পাশাপাশি নির্বাচন পরবর্তী নির্বাচনী ব্যয় সম্পর্কিত দাখিলকৃত রিটার্নও যাচাই-বাছাইয়েরও কোনো ব্যবস্থা নেই।

৩.২.৭ নির্বাচনী প্রচারণায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ না থাকা

নির্বাচনী প্রচারণায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন, ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ইত্যাদির সম্পর্কে উল্লেখ করা নেই। অর্থাৎ প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণায় সভা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণা চালালেও প্রচারণার অন্যতম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, এসএমএস, ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট ইত্যাদি মাধ্যমগুলোকে[২৩] সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রচারণা চালিয়েছেন যা নির্বাচনী আচরণ-বিধিতে উল্লেখ নেই। ফলে অবাধে অর্থ ব্যয় করে নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগ যেমন সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি প্রচারণার জন্য নির্ধারিত সময়ের পরেও প্রচারণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৪. গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের হলফনামা অনুযায়ী তথ্য

৪.১ প্রার্থীদের লিঙ্গ পরিচয়

গবেষণা নমুনার অন্তর্ভুক্ত নয়জন মেয়র প্রার্থী এবং ৫৬ জন সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী সবাই পুরুষ। অপরদিকে, সংরক্ষিত কাউন্সিলর ৪৫ জন প্রার্থীর সবাই নারী।

৪.২ প্রার্থীদের বয়স

মেয়র প্রার্থীদের গড় বয়স ৫৪; এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৪ বছর এবং সর্বনিম্ন ৩৬ বছর বয়সের প্রার্থী। সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের গড় বয়স যথাক্রমে ৫২ বছর; এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৯ বছর এবং সর্বনিম্ন ৩৫ বছর বয়সের প্রার্থী। সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৩ বছর ও সর্বনিম্ন ২৮ বছর বয়সের প্রার্থী ছিলেন, এদের গড় বয়স ৪৫ বছর। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের অধিকাংশই মূলত ৩৪ বছর হতে ৫৪ বছর বয়সের মধ্যে।

---

[২২] *দৈনিক যুগান্তর*, ২৩ এপ্রিল ২০১৫।

[২৩] এ সকল মাধ্যমগুলোতে নির্বাচনী গণসংযোগের ছবি, তথ্য, ভিডিও ক্লিপ, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, পরবর্তী দিনের কর্মসূচি প্রভৃতি তথ্যসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৩: প্রার্থীদের বয়স (সংখ্যা ও শতকরা হারে)

বয়স	মেয়র		সাধারণ কাউন্সিলর		সংরক্ষিত কাউন্সিলর	
	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার
২৫-৩৪	-	-	-	-	২	৪.৪
৩৪-৪৪	১	১১.১	১৬	২৮.৫৭	২২	৪৮.৯
৪৫-৫৪	২	২২.২	১৫	২৬.৭৯	১৬	৩৫.৬
৫৫-৬০	৩	৩৩.৩	১৩	২৩.২১	৩	৬.৭
৬১ ও এর উর্ধ্বে	৩	৩৩.৩	১২	২১.৪৩	৩	৬.৭
মোট	৯	১০০.০	৫৬	১০০.০	৪৫	১০০.০

৪.৩ প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

নয়জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে পাঁচজন তথা অর্ধেকেরও বেশি (৫৫.৫%) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। তবে একজন মেয়র প্রার্থী নিজেকে স্ব-শিক্ষিত হিসেবে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন। সাধারণ কাউন্সিলরদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২১.৪ শতাংশ প্রাথমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের সর্বোচ্চ ২৪.৪ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতের হার (১৭.৮%) মেয়র (৫৫.৫%) ও সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী (২৮.৬%) অপেক্ষা কম।

সারণি ৪: প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	মেয়র		সাধারণ কাউন্সিলর		সংরক্ষিত কাউন্সিলর	
	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার
স্বশিক্ষিত	১	১১.১	৬	১০.৭	৪	৮.৯
প্রাথমিক	০	০০.০	১২	২১.৪	৫	১১.১
মাধ্যমিক	২	২২.২	৯	১৬.১	১১	২৪.৪
উচ্চ মাধ্যমিক	১	১১.১	২	৩.৬	৪	৮.৯
স্নাতক	৩	৩৩.৩	৮	১৪.৩	৫	১১.১
স্নাতকোত্তর	২	২২.২	৮	১৪.৩	৩	৬.৭
অন্যান্য	০	০০.০	১১	১৯.৬	১৩	২৮.৯
মোট	৯	১০০.০	৫৬	১০০.০	৪৫	১০০.০

৪.৪ প্রার্থীদের পেশা

পেশাগত দিক থেকে সব মেয়র প্রার্থী হলফনামায় নিজেদের প্রধান পেশা হিসেবে ব্যবসা উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা নিজেদের প্রধান পেশা হিসেবে যথাক্রমে ব্যবসা (৭৩.২%) ও গৃহকর্মের (৪৬.৭%) কথা উল্লেখ করেছেন।

সারণি ৫: প্রার্থীদের পেশাগত যোগ্যতা

পেশা	মেয়র		সাধারণ কাউন্সিলর		সংরক্ষিত কাউন্সিলর	
	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যবসায়ী	৯	১০০.০	৪১	৭৩.২	১১	২৪.৪
আইনজীবী	-	-	৩	৫.৪	২	৪.৪
কৃষিজীবী	-	-	-	-	১	২.২
শিক্ষকতা	-	-	২	৩.৬	২	৪.৪
গৃহকর্মী	-	-	-	-	২১	৪৬.৭
অন্যান্য	-	-	১০	১৭.৯	৮	১৭.৮
মোট	৯	১০০.০	৫৬	১০০.০	৪৫	১০০.০

৪.৫ প্রার্থীদের মাসিক আয়

মেয়র প্রার্থীদের মাসিক গড় আয় ২৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৩১ টাকা। পক্ষান্তরে, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গড় মাসিক আয় যথাক্রমে চার লক্ষ ৯৪ হাজার ৩২৭ টাকা ও এক লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৯৪ টাকা।

সারণি ৬: প্রার্থীদের মাসিক আয়ের পরিমাণ (টাকায়)

ধরন	মেয়র	সাধারণ কাউন্সিলর	সংরক্ষিত কাউন্সিলর
গড়	২৮,৫১,৫৩১	৪,৯৪,৩২৭	১,৬৮,৬৯৪
সর্বোচ্চ	১,২১,৭৬,৮৪৫	৭১,৫০,০০০	৭,৮০,০০০
সর্বনিম্ন	৪,৫৫,৮৯৭	৭,৪৬৭	৫,০০০

৪.৬ প্রার্থীদের সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়

মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী হলফনামায় দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে সর্বনিম্ন ২৩ লক্ষ ৫১ হাজার পাঁচশত টাকা হতে সর্বোচ্চ ৪৯ লক্ষ ২৮ হাজার সাতশত ৫০ টাকার কথা উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে, সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীরা সর্বনিম্ন ৫১ হাজার একশত টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা সর্বনিম্ন ২১ হাজার চারশত টাকা থেকে সর্বোচ্চ ছয় লক্ষ টাকার কথা উল্লেখ করেছেন।

সারণি ৭: প্রার্থীদের সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমাণ (টাকায়)

ধরন	মেয়র	সাধারণ কাউন্সিলর	সংরক্ষিত কাউন্সিলর
গড়	৩৩,৪৬,৫৪৪	২,৮৩,০০০	৩,৪৫,০০০
সর্বোচ্চ	৪৯,২৮,৭৫০	৫,৯০,০০০	৬,০০০০০
সর্বনিম্ন	২৩,৫১,৫০০	৫১,১০০	২১,৪০০

৪.৭ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে চলমান ফৌজদারি মামলা

চলমান ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্যে দেখা যায় নয়জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা চলমান রয়েছে। এদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ৩৭টি মামলার তথ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ৪১.০৭ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাতটি করে দুইজন কাউন্সিলর প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার তথ্য পাওয়া যায়। সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের পাঁচজনের (১১.১১%) বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার তথ্য পাওয়া যায়।

৫. নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

৫.১ দলীয় সমর্থন পেতে অর্থ লেনদেন

মেয়র পদে দলীয় সমর্থন পাওয়ার জন্য কোনো কোনো প্রার্থীর অর্থ দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রার্থীদের সর্বনিম্ন ২০ লক্ষ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭ কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের অভিযোগ রয়েছে। তবে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মেয়র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় নি। সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, দলীয় তহবিল, উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক দলের উর্ধ্বতন নেতা ও উপদেষ্টাকে প্রার্থী নিজে ও প্রার্থীর পক্ষে স্থানীয় ঠিকাদার, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একাংশ এই অর্থ মেয়র প্রার্থীদের পক্ষে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে, কাউন্সিলর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দলীয় সমর্থন পাওয়ার জন্য প্রার্থীদের একাংশ কর্তৃক অর্থ দেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশকে দুই লক্ষ হতে পাঁচ লক্ষ

বক্স ১: একজন মেয়র প্রার্থীর দলীয় সমর্থন পেতে অর্থ লেনদেন

চট্টগ্রামের একজন মেয়র প্রার্থীর পক্ষ হয়ে একটি শিল্প গ্রুপ মেয়র পদে তাকে যোগ্য উপস্থাপন করে দলের শীর্ষ নেতাকে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য দু'টি সংস্থাকে পাঁচ কোটি টাকা প্রদান করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া এই মেয়র প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতাদের একাংশকে ১ কোটি টাকা করে অর্থ প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। এই অর্থ প্রদান করে চট্টগ্রাম বন্দরে কাজ করা একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে, দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ী যাদের বাড়ি চট্টগ্রামে, তারাও এক্ষেত্রে সরাসরি বা নেপথ্যে উক্ত মেয়র প্রার্থীর পক্ষে দলের তহবিলে অর্থ প্রদান করে। চট্টগ্রামের সংসদ সদস্যদের একাংশকেও সন্তুষ্ট রাখার জন্য এই মেয়র প্রার্থী অর্থ প্রদান করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এই অর্থ উক্ত মেয়র প্রার্থী তার নিজের তহবিল থেকে দেন নি বরং বিভিন্ন শিল্প গ্রুপ তার তহবিলে জমা দেন। এছাড়া স্থানীয় নেতা-কর্মীদের একাংশ নিজ অর্থে 'উক্ত প্রার্থীকে মেয়র হিসেবে দেখতে চাই' ব্যানারে বিভিন্ন পোস্টার, ব্যানার, প্ল্যাকার্ড, লিফলেট ও হ্যাণ্ডবিল প্রকাশ করে। এভাবে অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে দুইটি সংস্থার প্রতিবেদন, কেন্দ্রিয় নেতা, এলাকার সংসদ সদস্য ও নেতাকর্মীদের সমর্থনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলটি উক্ত প্রার্থীকে মেয়র প্রার্থী হিসেবে দলীয় সমর্থন দেন।

টাকা ও নারী কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশকে দুই লক্ষ হতে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, ঢাকার দুই সিটির সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশের ক্ষেত্রেও এক লক্ষ হতে আট লক্ষ টাকা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তবে ঢাকার সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের একাংশের ক্ষেত্রে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ থাকলেও অর্থের পরিমাণ জানা যায় নি। স্থানীয় সংসদ সদস্য, মেয়র প্রার্থী, স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের একাংশকে কাউন্সিলর প্রার্থী নিজে ও তাদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের পক্ষ হতে অর্থ প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে।

৫.২ মেয়র প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয়

মেয়র প্রার্থীদের গড় ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রার্থীরা গড়ে দুই কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।[২৪] অপরদিকে, ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণের প্রার্থীরা গড়ে যথাক্রমে এক কোটি ৬০ লক্ষ ও দুই কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে চট্টগ্রামের একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন যার পরিমাণ ছয় কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, ঢাকা উত্তরের শুধু একজন প্রার্থী নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যে তার নির্বাচনী ব্যয় সম্পন্ন করেন। তবে ঢাকার উত্তরের একজন মেয়র প্রার্থী সর্বোচ্চ তিন কোটি ৬০ লক্ষ টাকা এবং ঢাকার দক্ষিণের একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ তিন কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)।

বিধিমালা অনুযায়ী তিন সিটি কর্পোরেশনের জন্য সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ঢাকার উত্তরে ৫০ লক্ষ এবং ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রামের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হলেও মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রাক্কলন করে দেখা যায়, নয়জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে একজন ব্যতীত সবাই তাদের ব্যয়সীমা অতিক্রম করেছেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তিনজন মেয়র প্রার্থীকেই তাদের নির্বাচনী ব্যয়সীমা লঙ্ঘন করতে দেখা যায়।

চিত্র ১: নির্বাচনী প্রচারণায় মেয়র প্রার্থীদের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (কোটি টাকা)

রাজনৈতিক দলীয় সমর্থনভেদে মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীরা তিন সিটি কর্পোরেশনেই বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থী অপেক্ষা বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন। ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীরা গড়ে তিন কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ছয় কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। অপরদিকে, বিএনপির প্রার্থীরা ঢাকায় গড়ে এক কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা এবং চট্টগ্রামে এক কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থীরা যথাক্রমে ঢাকায় ৮৩ লক্ষ ও চট্টগ্রামে ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য)।

[২৪] নির্বাচনী ব্যয় সম্পর্কে চট্টগ্রামের দুই মেয়র প্রার্থীর প্রতিদিনে ব্যয় অর্ধকোটি টাকা। দৈনিক যুগান্তর, ১৯ এপ্রিল, ২০১৫।

চিত্র ২: রাজনৈতিক দলীয় সমর্থনভেদে মেয়র প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় (টাকা)

৫.৩ মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়ের খাতওয়ারি হার

তিন সিটি কর্পোরেশনে খাতভিত্তিক নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, পোস্টার ও লিফলেট বাবদ সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে ঢাকায় মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের ২৮.৮ শতাংশ এবং চট্টগ্রামে ২৭.৫ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেছে। এছাড়া নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন করে চট্টগ্রামে মেয়র প্রার্থীরা যাতায়াত ও পরিবহন (১০.৮%), জনসভা (১৭.৬%) ও মিছিল/শোডাউনে (১৪.৭%) অর্থ ব্যয় করেছেন। তবে ঢাকায় এই তিনটি খাতে অর্থ ব্যয়ের হার যথাক্রমে ৩.৭ শতাংশ, ৩.৫ শতাংশ ও ৬.১ শতাংশ। ঢাকার প্রার্থীরা প্রায় ১৯% অর্থ ব্যয় করেছেন অন্যান্য যেমন- নির্বাচনী এজেন্ট ও কর্মী ব্যয়, ফটোকপি, প্লাকার্ড, ডিজিটাল ব্যানার ইত্যাদি খাতে (চিত্র ৩ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৩: মেয়র প্রার্থীদের খাতওয়ারি নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের শতকরা হার

৫.৪ সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয়

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সম্পর্কিত বিধিমালা অনুযায়ী সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের সর্বোচ্চ প্রচারণা ব্যয়সীমা ছয় লক্ষ টাকা হলেও তিনটি সিটি কর্পোরেশনেই কাউন্সিলর প্রার্থীদের ব্যয়সীমা লঙ্ঘন করতে দেখা যায়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীরা গড়ে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন যার পরিমাণ ২৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। অন্যদিকে, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের কাউন্সিলর প্রার্থীরা ব্যয় করেছেন গড়ে ১৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা।

দলীয় সমর্থনভেদে দেখা যায়, কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে তিন সিটি কর্পোরেশনে আওয়ামী সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীরা (ঢাকায় ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা এবং চট্টগ্রামে ২৬ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা) বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের (ঢাকায় নয় লক্ষ ১৪ হাজার টাকা এবং চট্টগ্রামে ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা) তুলনায় বেশি ব্যয় করেছেন (চিত্র ৪ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৪: সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় (টাকা)

৫.৫ সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের খাতওয়ারি নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের হার

সাধারণ কাউন্সিলদের ব্যয়ের চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রামে প্রার্থীদের সর্বাধিক অর্থ ব্যয় হয়েছে ক্যাম্প স্থাপন (২১.০%) ও জনসংযোগ (১৯.৭%) বাবদ। পক্ষান্তরে, ঢাকার কাউন্সিলর প্রার্থীরা সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করেছেন যথাক্রমে পোস্টার, লিফলেট ও প্লাকার্ড (৩০.৬%) বাবদ। চট্টগ্রামের কাউন্সিলর প্রার্থীরা অন্য যেসব খাতে নির্বাচনী ব্যয় করেন সেগুলো হলো জনসভা (১৭.৪%) পোস্টার, লিফলেট ও প্লাকার্ড (১৬.০%), মিছিল বা শোডাউন (৫.৬%), ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (৭.৪%), মাইকিং (৫.৯%), যাতায়াত, পরিবহণ ও যোগাযোগ (৬.০%) ও অন্যান্য খাতে (১.০%) ব্যয় করে (চিত্র ৫ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৫: সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা বাবদ খাতওয়ারি ব্যয়ের হার (শতাংশ)

অন্যদিকে, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীরা অন্য যেসব খাতে নির্বাচনী ব্যয় করেন সেগুলো হলো জনসভা (৩.৬%), মিছিল বা শোডাউন (১১.৪%), ক্যাম্প স্থাপন (১০.৮%), জনসংযোগ (১৪.৩%), মাইকিং (৬.০%), যাতায়াত, পরিবহণ ও যোগাযোগ (৬.৪%), ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (০.৫%) ও অন্যান্য (১৬.৪%) যেমন- নির্বাচনী এজেন্ট, কর্মী, ব্যানার খাতে ব্যয় করেন।

৫.৬ সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়

আওয়ামী সমর্থিত প্রার্থীদের নির্বাচনী গড় ব্যয় বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের চেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। চট্টগ্রামে আওয়ামী ও বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় যথাক্রমে ১৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ও ১১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। অন্যদিকে, ঢাকায় আওয়ামী ও বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় যথাক্রমে ১৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ও আট লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, সিটি নির্বাচনে সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের সর্বোচ্চ গড় ব্যয়সীমা ঢাকায় নয় লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা এবং চট্টগ্রামে ১০ লক্ষ আট হাজার টাকা (চিত্র ৬ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৬: সংরক্ষিত কাউন্সিল প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী গড় ব্যয় (টাকা)

৫.৭ সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের খাতওয়ারি নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়ের হার

ঢাকায় প্রার্থীরা সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করেছেন যথাক্রমে পোস্টার ও লিফলেট (২৬.৩%) এবং কর্মী ও এজেন্ট বাবদ (১৪.৪%)। অন্যদিকে চট্টগ্রামের প্রার্থীদের সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করেছেন ক্যাম্প স্থাপন (২১.২%) ও জনসংযোগে (১৯.৮%) (চিত্র ৭ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৭: সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা বাবদ খাতওয়ারি ব্যয়ের হার (শতাংশ)

৫.৮ সকল প্রার্থীর আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের ধরন ও হার

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারণায় আচরণ বিধি কেমন হওয়া উচিত তা বলা থাকলেও প্রার্থীরা সচেতন বা অসচেতনভাবে অনেকক্ষেত্রে নির্বাচনী আচরণ বিধিগুলো মেনে চলে নি।[২৫] প্রার্থী নিজে এবং প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এ বিধিগুলো লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন পূর্ব সময়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির[২৬] ছাড়া নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রচারণার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।

নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা অনুযায়ী বিল বোর্ড ব্যবহার, গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ ও প্যাণ্ডেল, আলোকসজ্জার ব্যবহার, দুপুর ২ টার পূর্বে এবং রাত নয়টার পরে মাইকিং করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রচারণা চালানো, একসাথে একটির বেশি মাইক ব্যবহার করা, জনসভা করা, মনোনয়নের সময় ৫ জনের বেশি লোক নিয়ে শোডাউন করা, যানবাহন সহকারে মিছিল বা শোডাউন করা, কাউকে গোপনে বা প্রকাশ্যে চাঁদা দেওয়া, দেওয়ালে পোস্টার লাগানো ও পোস্টারের আকার ২৩x১৮ ইঞ্চির বেশি ও রঙ্গীন পোস্টার ব্যবহার, ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বক্তব্য দেওয়া, প্রার্থীর ছবি বা প্রতীকসহ টি-শার্ট বা জ্যাকেট ব্যবহার করা নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ রয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বাধিক ৫৮ শতাংশ প্রার্থী নির্বাচনী আচরণ-বিধি লঙ্ঘন করে ক্যাম্পে খাবার ও পানীয় প্রদান এবং ভোটারদের উপহার ও বকশিস প্রদান করেছেন, নির্ধারিত সময়ের আগে ও পরে প্রচারণার কাজে মাইক ব্যবহার করেছেন ৪২ শতাংশ এবং একই সময়ে একাধিক মাইক ব্যবহার করেছেন ৪১ শতাংশ প্রার্থী, ধর্মীয় উপসানলয়ে প্রচার কাজ চালিয়েছেন ৪২ শতাংশ প্রার্থী। এছাড়া নির্বাচনী আচরণ-বিধি লঙ্ঘন করে জনসভা (৪০%), মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় শো-ডাউন (২৬%), যানবাহন সহকারে মিছিল ও শো-ডাউন (২৩%), প্রার্থীদের পক্ষে প্রকাশ্যে ও গোপনে চাঁদা দেওয়া (২০%) ইত্যাদি ধরনের লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে (চিত্র ৮ দ্রষ্টব্য)। এসব আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি বলে তথ্য পাওয়া যায়।

চিত্র ৮: সকল প্রার্থীর আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের ধরন ও হার (N = ১১০)

[২৫] যেমন, বিলবোর্ড লাগানো, মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় শো-ডাউন করা এবং পাঁচজনের অধিক ব্যক্তিকে নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দান, নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রচারণা চালানো এবং মাইকিং করা, জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এ ধরনের স্থানে পথসভা এবং জনসভা করা ইত্যাদি।

[২৬] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন www.ec.org.bd

৬. তিন সিটি নির্বাচনে অংশীজনের ভূমিকা

একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার প্রধান ও সাংবিধানিক দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত। কমিশনের ওপর অর্পিত এ দায়িত্ব সফল করে তোলার ক্ষেত্রে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্য সকল অংশীজনের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে নির্বাচন কমিশন ছাড়াও বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত রয়েছে সরকার, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও সংগঠন, সংবাদ-মাধ্যম ও সর্বোপরি ভোটার ও জনগণ। এদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা একটি নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে সক্রিয় অবদান রাখে। তবে এসব প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনদের মধ্যে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে বলে জনগণকে সাথে নিয়ে একটি নির্বাচনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করতে পারে তারাই। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত অংশীজনরা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রেখেছে তা তুলে ধরা হলো:

৬.১ নির্বাচন কমিশন

কোনো নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবারের তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ভূমিকাই লক্ষণীয়। তবে কমিশনের দৃঢ় ভূমিকার অভাব এবং নির্বাচনী প্রচারাভিযানকালে, নির্বাচনের দিন, এবং নির্বাচনের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে যথাযথ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ করা যায় যা কমিশনের ভূমিকাকে ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। কমিশনের ইতিবাচক পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রার্থীদের হলফনামা, আয়-ব্যয়, ও আয়কর রিটার্ন সম্পর্কিত তথ্য স্ক্যান করে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা ও প্রার্থীদের আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ, মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে ভোটারদের ভোট কেন্দ্র সম্পর্কে জানানো ও ওয়েবসাইটে ভোট কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য প্রদান, প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত মেয়র প্রার্থীসহ তিনটি সিটি কর্পোরেশনের কিছু সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সতর্ক নোটিশ ও আর্থিক জরিমানা করা। যেমন- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ১০ এপ্রিল হতে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে ১০০টিরও বেশি অভিযোগ জমা পড়ে, যার মধ্যে প্রায় ৭১টির বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।[২৭] এছাড়াও বিধি ভঙ্গ করে মাইকিং করার জন্য একজন মেয়র প্রার্থীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।[২৮] পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটারদের জন্য ওয়েরসাইটে ভোটকেন্দ্র সম্পর্কিত যে তথ্য দেখতে বলা হয়েছিল কারিগরি ত্রুটির কারণে অনেকেই এর সুবিধা পায় নি।

অন্যদিকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীতা বাতিলের মতো কোনো কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায় নি। এছাড়াও সেনা মোতায়েনের বিষয়ে প্রথম পর্যায়ে নির্বাচন কমিশন একমত হলেও পরবর্তীতে তা বাতিল করে রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে তাদের ব্যারাকে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত জনমনে বিতর্ক সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থীরা সেনা মোতায়েন ছাড়া অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেন।[২৯] প্রচারণাকালে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘন ও ভোটের দিন বিভিন্ন জায়গায় রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ করা হলেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিরোধে কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপের অভাব লক্ষ করা গেছে।

বক্স ২: অভিযোগ করা হলেও রিটার্নিং কর্মকর্তার পদক্ষেপ না নেওয়া

ঢাকার দক্ষিণের একটি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর কর্মীরা অস্ত্রের মুখে একশ' করে ব্যালট পেপার সিল মারে। এর কিছুক্ষণ পরেই তারা পুনরায় ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিতে আসলে দু'জন পোলিং কর্মকর্তা তা প্রিসাইডিং কর্মকর্তাকে জানায়। প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ভোটকেন্দ্রের এই ঘটনা রিটার্নিং কর্মকর্তাকে জানালে তিনি কোনো পদক্ষেপ নেন নি বরং বলেন, ''বাতাস যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকে চলেন।"

ভোট কেন্দ্র ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়া পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কোথাও কোথাও নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্তৃক ভোট জালিয়াতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ, ভোটের দিন কেন্দ্র দখল, কারচুপি, ভীতি প্রদর্শন, অবাধে ব্যালট পেপারে সিল মারা ইত্যাদি অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা[৩০], নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কর্মীদের ভোট কেন্দ্রে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও বিভিন্ন কেন্দ্রে সাংবাদিকদের হামলার শিকার হওয়া বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার মতো নেতিবাচক ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা যায়। সর্বোপরি কমিশনের দুর্বল অবস্থানের কারণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হতে দেখা যায় নি।

---

[২৭] দৈনিক যুগান্তর, ২২ এপ্রিল ২০১৫।

[২৮] প্রাগুক্ত।

[২৯] দৈনিক যুগান্তর, ২৪ এপ্রিল, ২০১৫।

[৩০] তিন সিটি নির্বাচনে কেন্দ্র দখল, জাল ভোট , নির্বাচনী ফলাফল জালিয়াতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে শতাধিক অভিযোগপত্র রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন কমিশনে জমা পড়লেও ইসি তা আমলে নিচ্ছে না। *দৈনিক যুগান্তর*, ৩০ এপ্রিল, ২০১৫।

৬.২ রাজনৈতিক দল

তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত সবাই সাদরে গ্রহণ করে। তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকাশ্যে প্রার্থীদের দলীয় সমর্থন দেয়, যা বিতর্কের সৃষ্টি করে। বিধি-বহির্ভূতভাবে এই সমর্থন প্রদান এত ব্যাপক ছিল যে আইনগত পরিবর্তন এনে দলীয়ভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। আওয়ামী লীগ এককভাবে একজন প্রার্থীর পেছনে সমর্থন ঘোষণা করা ছাড়াও দলের বিদ্রোহী প্রার্থীদের[৩১] প্রার্থিতা প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া দল সমর্থিত প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী কর্তৃক নানাভাবে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। নেতা-কর্মী (স্থানীয় ও বহিরাগত) দ্বারা ভোট কেন্দ্রসমূহের একাংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ, পোলিং কর্মকর্তাদের ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া[৩২] ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই, প্রকাশ্যে সিল মারাসহ বিভিন্নভাবে ভোট জালিয়াতি, সংসদ সদস্য কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকসহ অন্যান্যদের নির্বাচনী প্রচারণায় অন্তর্ভুক্তকরণ, নগদ ভাতা প্রদান এবং ভোটের দিন ভোট কেন্দ্র দখলে সহায়তা ও প্রভাব বিস্তার, বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীর কর্মীদের ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ ও অবস্থানে বাধা প্রদান, আওয়ামী সমর্থিত প্রার্থী ও বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন দিনে সংঘর্ষ ইত্যাদি ঘটনা আওয়ামী সমর্থিত প্রার্থীর কর্মী কর্তৃক সংঘটিত হয়। অপরদিকে, বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও বিএনপির নির্বাচনী এজেন্ট না দেওয়া, ভোট কেন্দ্রের বাইরে দলটির সমর্থক কর্মীদের অনুপস্থিতি; প্রার্থীদের মতামত না নিয়ে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্বাচন বর্জনে বাধ্য করা ইত্যাদি।

বক্স ৩: রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থীতা প্রত্যাহারে বাধ্য করা

রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি তাদের দল বা জোটের পক্ষ থেকে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে সমর্থন দিচ্ছেন এবং দলীয় সমর্থক অন্য কোনো ব্যক্তি প্রার্থী হলে তাকে প্রার্থীতা প্রত্যাহারে বাধ্য করছেন এবং দল বা জোটের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতারাও সরাসরি নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন, যা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিধিমালার পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে দলীয় সমর্থক একজন ঊর্ধ্বতন নেতা বলেন, সকল বিদ্রোহী প্রার্থীকে নির্বাচন থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে দল সমর্থিত প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করতে বলা হয়েছে, যদি তারা নির্বাচন থেকে সরে না আসে তাহলে তাদের বহিষ্কার করা হবে। এতে ইচ্ছা থাকলেও স্বাধীনভাবে সকলের ক্ষেত্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব হয় না।

৬.৩ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভুমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় পদক্ষেপ না নেওয়া এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালনসহ কোথাও কোথাও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাংশ কর্তৃক ভোট জালিয়াতিতে সরাসরি অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়।

বক্স ৪: আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্বে অবহেলা

তিন সিটি নির্বাচনে ভোটগ্রহণ পরিস্থিতির দৃশ্য ধারণে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণে ২৩টি করে মোট ৪৬টি ও চট্টগ্রামে ১২টি সবমিলিয়ে ৫৮টি কেন্দ্রে ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিলেও ভিডিও দৃশ্য ধারণে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর কর্মী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বাধা দেয়। এমনকি জাল ভোটের দৃশ্য ধারণে ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং ধারণকৃত ভিডিও মুছে ফেলে তা ফেরত দেয়া হয়। সূত্র: *দৈনিক যুগান্তর*, ১ মে ২০১৫

৬.৪ নাগরিক সমাজ ও সংগঠন

তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে ঘিরে যেহেতু সকল মহলের মধ্যে একটি আশার সঞ্চার হয়েছিল সেহেতু নাগরিক সমাজও এই নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। তারা প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য ও নির্বাচনী ইশতেহার, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ইত্যাদির ওপর বিশ্লেষণমূলক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করেছে, সঠিক প্রার্থী নির্বাচন, প্রার্থীদের নিয়ে সরাসরি টকশো ও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান গোলটেবিল আলোচনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তবে নাগরিক সমাজের দুইটি অংশ দুইটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালায় যা জনমনে বিতর্কের সৃষ্টি করে।

৬.৫ ভোটার

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারদের কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভোটারদের অনেকে ভোট দিতে পারলেও অনেক ক্ষেত্রে জাল ভোট প্রদান ও বাধার মুখে কেউ কেউ ভোট দিতে পারে নি। তাছাড়া নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানের জন্য ভোটারদের প্রার্থীদের আয়োজনে ভোট কেন্দ্রে আসা এবং ভোটের আগের দিন রাতে বিভিন্ন বস্তি ও কলোনীতে প্রার্থী কর্তৃক বিতরণকৃত অর্থ নিম্ন আয়ের লোকজন দ্বারা গ্রহণ লক্ষণীয়।

৬.৬ সংবাদমাধ্যম (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট)

[৩১] দলের অপর কোনো সদস্য যারা দলের সমর্থন ছাড়াই প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন।

[৩২] ঢাকা উত্তরের একজন মেয়র প্রার্থীর পক্ষে বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রায় ৮০০ জন পোলিং এজেন্টকে বের করে দিয়েছে সরকার সমর্থক ও পুলিশ। *দৈনিক যুগান্তর*, ৩০ এপ্রিল ২০১৫।

তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব ভূমিকার মধ্যে প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য ও নির্বাচনী ইশতেহারের তথ্য ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া নির্বাচনী প্রচারণা কার্যক্রম ও আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা, নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য অংশীজনের কর্মকাণ্ড বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ করেছে। বেসরকারি চ্যানেলগুলোতে প্রার্থীদের নিয়ে সরাসরি টকশো ও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান কার্যক্রম প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে, যা ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নির্বাচনের দিন কেন্দ্রভিত্তিক অনিয়ম তুলে ধরার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে নির্বাচনকালীন সময়ের প্রথম দিকে প্রধান দুটি দলসমর্থিত মেয়র প্রার্থীদের প্রচারণা সংক্রান্ত সংবাদ অন্য প্রার্থীর তুলনায় বেশি প্রাধান্য পেলেও পরবর্তীতে অন্য প্রার্থীদের ও প্রচারণা সংক্রান্ত সংবাদ গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হয়।

৭. উপসংহার ও সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কার্যত একটি দলীয় নির্বাচনে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থী নির্বাচন ও সমর্থন প্রদান, প্রার্থীদের পক্ষ থেকে দলীয় সমর্থন নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো, দলের পক্ষ থেকে সমর্থন নেই এমন কোনো দলীয় সদস্য প্রার্থী হলে নির্বাচন বর্জনে চাপ সৃষ্টি বা বাধ্য করা, সরকারের পক্ষ থেকে সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা ব্যবহার ও প্রভাব বিস্তার করা ইত্যাদি ঘটনা একটি ব্যর্থ নির্বাচনেরই বহিঃপ্রকাশ।

নির্বাচনে প্রার্থী প্রতি ব্যয়ের সীমা যেমন খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা নেই, তেমনি মেয়র ও সাধারন কাউন্সিলর প্রার্থীদের জন্য ব্যয়ের সীমা উল্লেখ করা থাকলেও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের তিনটি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ব্যয়সীমা উল্লেখ করা নেই। নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা নেই, নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নির্দিষ্ট সময়অন্তর হালনাগাদের বিষয় উল্লেখ করা নেই, এবং প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত দাখিলকৃত রিটার্ন যাচাইয়েরও ব্যবস্থা নেই। এতে প্রার্থীদের মধ্যে নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া নির্বাচনী প্রচারণায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন, ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখ করা নেই। ফলে অবাধে অর্থ ব্যয় এবং নির্ধারিত সময়ের পরেও প্রচারণার সুযোগ সৃষ্টি হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, সকল ধরনের প্রার্থীই তাদের নির্বাচনী ব্যয়সীমা এবং আচরণ-বিধিও লঙ্ঘন করেছে।

ভোটের দিন কোনো কোনো ক্ষেত্রে রিটার্নিং কর্মকর্তা, প্রিজাইডিং কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। নির্বাচনে দিন কোনো কোনো কেন্দ্রে ভোট কেন্দ্র দখল, ভোট জালিয়াতি এবং নির্বাচনী এজেন্টদের ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে না দেওয়া এবং বের করে দেওয়া সত্ত্বেও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায় নি।

নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তা দেখাতে না পারা, নির্বাচনী আইন সব প্রার্থীর জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করতে না পারা, আচরণ বিধি লঙ্ঘনে সকল প্রার্থীর ক্ষেত্রে সমানভাবে পদক্ষেপ নিতে না পারার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় নির্বাচন কমিশন ও আইন-শঙ্খলা বাহিনী সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করায় তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলা যায় না।

সুপারিশ

১. সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনী আইনের সংস্কার ও হালনাগাদ করতে হবে-
   - সকল প্রার্থীর নির্বাচনী সর্বোচ্চ ব্যয়ের সীমা খাত অনুযায়ী (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ) নির্দিষ্ট করতে হবে;
   - নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের বিধান রাখতে হবে;
   - নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;
   - সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের ব্যয়সীমা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট করতে হবে;
   - প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত দাখিলকৃত রিটার্ন যাচাই-বাছাইয়ের বিধান রাখতে হবে;
   - সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারকে নির্বাচনী বিধির আওতায় আনতে হবে।

২. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীর হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।
৩. ভোট জালিয়াতি বন্ধ করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এবং ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ব্যবহার করতে হবে।
৪. নির্বাচন কর্মকর্তা (প্রিজাইডিং, রিটার্নিং, ও পোলিং কর্মকর্তা) এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত পরিবেশে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. ভোট কেন্দ্রে সাংবাদিকদের সহজ প্রবেশাধিকারসহ নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. নির্বাচনী আচরণবিধি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা প্রচারের ব্যবস্থা থাকতে হবে; এক্ষেত্রে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ও অন্যান্য সামাজিক মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৭. রাজনৈতিক প্রভাব ও বাইরের চাপ উপেক্ষা করে দায়িত্ব পালনের মত যোগ্য ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দিতে হবে।

৮. অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে তার সাংবিধানিক ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

.....

পরিশিষ্ট ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিন সিটি কর্পোরেশনে ভোটের সার্বিক চিত্র

পরিশিষ্ট ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিন সিটি কর্পোরেশনে ভোটের সার্বিক চিত্র

সিটি এলাকা	ভোট ভোটারের সংখ্যা	সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা	বৈধ ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের হার	বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা	বাতিলকৃত ভোটের হার
ঢাকা উত্তর	২৩,৪৪,৯০০	৮,৭৪,৫৮১	৮,৪১,০০০	৩৭.৩	৩৩,৫৮১	৩.৯২
ঢাকা দক্ষিণ	১৮,৭০৭,৭৮	৯,০৫,৪৮৪	৮,৬৫,৩৫৪	৪৮.৪	৪০,১৩০	৪.৬৪
চট্টগ্রাম	১৮,১৩,৪৪৯	৮,৬৮,৬৬৩	৮,২১,৩৭১	৪৭.৯	৪৭,২৯২	৪.৭৬
মোট	৬০,২৯,১২৭	২৬,৪৮,৭২৮	২৫,২৭,৭২৫	৪৩.৯	১,২১,০০৩	৪.৫৭

সূত্র: প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল/বার্তা প্রেরণ সিট হতে সংকলিত (যঃঃঢ়://নফহবিং২৪.পড়স/নধহমষধফবংয/২০১৫/০৪/৩০/ৎবঁংহরহম-ড়ভভরপবৎং-ধহহড়ঁহপব-ভঁষষ-ৎবঁংষঃং-ড়ভ-ঃযৎবব-পরঃু-পড়ৎঢ়ড়ৎধঃরড়হ-ঢ়ড়ষষং)

পরিশিষ্ট ২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রার্থীদের প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল

সিটি কর্পোরেশন	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	সমর্থক দল	প্রাপ্ত ভোট	মোট বৈধ ভোটের শতকরা হার	ফলাফল
ঢাকা উত্তর	আনিসুল হক	আওয়ামী লীগ	৪৬০১১৭	৫৪.৭১	প্রথম/জয়ী
	তাবিথ আউয়াল	বিএনপি	৩২৫০৮০	৩৮.৬৫	দ্বিতীয়
	বাহাউদ্দীন আহমেদ	জাতীয় পার্টি	২৯৫০	০.৩৫	সপ্তম
ঢাকা দক্ষিণ	মোহাম্মদ সাইদ খোকন	আওয়ামী লীগ	৫৩৫২৯৬	৬১.৮৬	প্রথম/জয়ী
	মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ	বিএনপি	২৯৪২৯১	৩৪.০১	দ্বিতীয়
	মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন	জাতীয় পার্টি	৪৫১৯	০.৫২	চতুর্থ
চট্টগ্রাম	আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন	আওয়ামী লীগ	৪৭৫৩৬১	৫৭.৮৭	প্রথম/জয়ী
	মোহাম্মদ মনজুর আলম	বিএনপি	৩০৪৮৩৭	৩৭.১১	দ্বিতীয়
	মো. সোলায়মান শেঠ	জাতীয় পার্টি	৬১৩১	০.৭৫	পঞ্চম

তথ্যসূত্র: প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল, বার্তা প্রেরণ শিট হতে সংকলিত (যঃঃঢ়://নফহবিং২৪.পড়স/নধহমষধফবংয/২০১৫/০৪/৩০/ৎবঁংহরহম-ড়ভভরপবৎং-ধহহড়ঁহপব-ভঁষষ-ৎবঁংষঃং-ড়ভ-ঃযৎবব-পরঃু-পড়ৎঢ়ড়ৎধঃরড়হ-ঢ়ড়ষষং)

পরিশিষ্ট ৩: তিন সিটিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে প্রার্থীদের ফলাফল

এলাকা	সাধারণ কাউন্সিলর				সংরক্ষিত কাউন্সিলর			
	আওয়ামী লীগ সমর্থিত (বিদ্রোহীসহ)	বিএনপি সমর্থিত	জামায়াত/জাতীয় পার্টি সমর্থিত/অন্যান্য	মোট	আওয়ামী লীগ সমর্থিত (বিদ্রোহীসহ)	বিএনপি সমর্থিত	জামায়াত/জাতীয় পার্টি সমর্থিত/অন্যান্য	মোট
ঢাকা উত্তর	৩১	১	৪	৩৬	৬	৩	৩	১২
ঢাকা দক্ষিণ	৪০	৫	১২	৫৭	১৩	৫	১	১৯
চট্টগ্রাম	৩৫	৫	১	৪১	১১	২	১	১৪
সর্বমোট	১০৬	১১	১৭	১৩৪	৩০	১০	৫	৪৫

তথ্যসূত্র: ৩০ এপ্রিল, দৈনিক প্রথম আলো, বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক কালের কণ্ঠ

পরিশিষ্ট ৪: নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ২০১০ অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য বিধি-নিষেধসমূহ

নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ২০১০ অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য বিধি-নিষেধসমূহ

- ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখের একুশ (২১) দিন পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করা যাবে না;
- প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকা বা অন্য এলাকায় অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা যাবে না;
- সরকারি ডাক বাংলো, রেস্ট হাউস, সার্কিট হাউস বা কোনো সরকারি কার্যালয়কে দল বা প্রার্থীর পক্ষে/বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না;
- জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করে কোনো সড়কে জনসভা বা শোভাযাত্রা করা যাবে না;
- প্রতিপক্ষের পথসভা বা ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড বা উহাতে বাধা প্রদান করা যাবে না;
- প্রচারণায় পোস্টার সাদা-কালো রঙের ও এর আয়তন ২৩X১৮; পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি ও এর আকার ২৩X১৮ এর অধিক হতে পারবে না;
- প্রার্থীর পোস্টারে ছাপানো ছবি কোনো অনুষ্ঠান বা মিছিলে নিতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছাপানো যাবে না;
- প্রার্থীর নিজ ছবি ও প্রতীক ব্যতীত অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নাম বা প্রতীক বা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম বা ছবি ব্যবহার করতে পারবে না;
- নির্বাচনী প্রতীকের আকার দৈর্ঘ্য প্রস্থ বা উচ্চতায় তিন মিটার এর অধিক এবং এর রং একাধিক করা যাবে না;
- নির্বাচনী পোস্টারে মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ও তারিখ ব্যতীত পোস্টার লাগানো যাবে না;
- প্রার্থীর পোস্টার বা লিফলেট ইত্যাদির ওপর অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার বা লিফলেট লাগানো এবং কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন করা যাবে না;
- দেওয়াল বা বেড়া এবং যানবাহনে কোনো প্রকার পোস্টার বা লিফলেট লাগানো যাবে না;
- মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল কিংবা শো-ডাউন করতে পারবে না এবং পাঁচ জনের অধিক সমর্থক লইয়া মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবে না;
- মেয়র প্রার্থী-প্রতি থানায় একের অধিক ক্যাম্প/অফিস স্থাপন করতে পারবে না এবং কাউন্সিলর প্রার্থী ত্রিশ হাজার ভোটারের হারে একের অধিক এবং সর্বোচ্চ তিনটির অধিক ক্যাম্প/অফিস স্থাপন করতে পারবে না;
- নির্বাচনী ক্যাম্প/অফিসে টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না;
- নির্বাচনের দিন কোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোটকেন্দ্রে/ ভোটকেন্দ্র হতে ভোটারদের আনা নেওয়ার জন্য কোনো প্রকার যানবাহন ব্যবহার করা যাবে না;
- দেওয়ালে লিখা বা আঁকার মাধ্যমে বা বিলবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না;
- প্রচারণায় গেইট বা তোরণ নির্মাণ করা যাবে না এবং প্রচারণার জন্য প্যাণ্ডেল, আলোকসজ্জা ইত্যাদি করা যাবে না;
- প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক বক্তব্য বা প্রার্থীর ছবি বা চিহ্ন সম্বলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না;
- নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন, বকশিশ ইত্যাদি প্রদান করা যাবে না;
- প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে কোনো ধরনের তিক্ত বা উস্কানীমূলক বক্তব্য কিম্বা লিঙ্গ বা
  সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এ ধরনের বক্তব্য দিতে পারবে না এবং গোলযোগ বা উচ্ছৃংখল আচরণ দ্বারা কারো শান্তি ভঙ্গ করা যাবে না;
- মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না;
- পথসভার জন্য একটি ওয়ার্ডে একই সংঙ্গে একটি এবং নির্বাচনী প্রচারণার জন্য একটির অধিক মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যাবে না;
- মাইক্রোফোন যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর দুইটার পূর্বে এবং রাত নয়টার পরে করা যাবে না;
- কোনো প্রার্থীর পক্ষে জাতীয় সংসদের স্পীকার, ডেপুটী স্পীকার, চীফ হুইপ, হুইপ, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন সরকারী সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও কোনো সরকারি কর্মকর্তা নির্বাচনী প্রচারণা বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে না;
- নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে উহা একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং উপরোক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে;